শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

সৈয়দ শামসুল হক

তাম্রলিপি

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প
সৈয়দ শামসুল হক

গ্রন্থস্বত্ব : আনোয়ারা সৈয়দ হক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৯০

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস
১৮/২৩ গোপাল শাহ লেন, ঢাকা

মূল্য : ৩০০.০০

Sreshto Kishoregolpo
By : Syed Shamsul Haque
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka–1100

Price : 300.00 $10

ISBN : 978-984-98737-8-5

উৎসর্গ

মঈন আহমেদ
সৈয়দ হক-এর প্রিয় কথাশিল্পী

ভূমিকা

বাংলাদেশের কবি–সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। তিনি নেই, তাঁর লেখা আছে, থাকবে হয়তো অনন্তকাল। সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ ছিল। শিশু কিশোরদের জন্যও তাঁর অসামান্য সব লেখা রয়েছে। সেখান থেকে মাত্র কয়েকটা গল্প নিয়ে বর্তমান সংকলন—শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প।

সংকলনে তাঁর গল্প সংযোজন করতে আমাকে সাহায্য কিংবা নির্দেশ করেছেন তাঁর প্রিয়তম পত্নী, অকৃত্রিম বন্ধু এবং অভিভাবকও বটে বাংলা সাহিত্যের আর একজন দিকপাল কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক—আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সৈয়দ শামসুল হক-কে নিয়ে কিছু বলার ধৃষ্ঠতা করব না। আনোয়ারা আপার অনুমতি সাপেক্ষে তাঁর গল্পগুলো নির্বাচন করে সীমিত পরিসরে এই 'শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প' প্রকাশ করতে কাজ করেছি। বলাবাহুল্য, এই বইয়ের অন্তর্গত সমস্ত লেখার বানান লেখক জীবদ্দশায় যা রেখে গেছেন সেটাই সযত্নে এখানে রাখা হয়েছে।

এই বইটি আনোয়ারা আপা উৎসর্গ পত্রে আমার নামটাই লিখে দিয়েছেন। আমার হাতে দেওয়ার সময় বলেছেন—হক জীবিত থাকলে তোমাকেই উৎসর্গ করতেন। আমারও স্মৃতিচারণ করতে লোভ হচ্ছে—হক ভাই আর আমার অত্যন্ত নিবিড় একটা সম্পর্ক ছিল।

মঈন আহমেদ

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা	১১
জানোয়ার	৩৯
বদলি	৪৭
নষ্ট এক ঈদের কষ্ট	৫৮
গন্ধ গোয়েন্দা	৬৬
আনু বড় হয়	৭৫
পড়ুয়া	১০৪
বাবার সাথে যাওয়া	১১২
নৌকার গল্প	১২১
এক যে ছিল গল্প	১২৫
কলমের গল্প	১৩২

বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা

টুঙ্গিপাড়া! আমাদের দেশে কত গ্রাম গঞ্জ বড় ছোট কত শহর, কত রকম নাম। সব নাম ছাপিয়ে ছোট্ট একটি গ্রামের নাম সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছে বাংলাদেশের ইতিহাসে-টুঙ্গিপাড়া!

টুঙ্গিপাড়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা একটি মানুষের নাম—শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি জন্ম নিয়েছিলেন টুঙ্গিপাড়ায়। জাতির জনক তিনি, বাংলার ইতিহাসে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র তিনি।

সেই নক্ষত্রের অক্ষরেই লেখা হয়ে আছে তাঁর জীবনের সারকথা—জয় বাংলা!

জন্ম তাঁর টুঙ্গিপাড়ায়।

কোথায় টুঙ্গিপাড়া?

গ্রামটি গোপালগঞ্জ শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

গোপালগঞ্জের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মধুমতি নদী। টলটল কলকল তার পানি। সেই নদীর পাড় দিয়ে সড়ক। সেই সড়ক দিয়ে যেতে যেতে আমরা পৌঁছে যাবো টুঙ্গিপাড়া।

গাছের সবুজে সবুজে ঢাকা এই গ্রাম। পাখির কলরবে ভরা ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। মধুমতির শাখা নদী। এ নদীর নাম বাইগার।

বাইগার নদীর তীরে অনেকটা জায়গা নিয়ে অনেকদিনের পুরনো এক বসতবাড়ি। আসলে অনেকগুলো বাড়ি। পাতলা লাল ইটের বাড়ি, আর অনেক পুরনো। কয়েকশ' বছরের পুরনো। শেখদের বাড়ি। চার শতাব্দী আগে শেখ আউয়াল নামে একজন দরবেশ এখানে আসেন। তাঁর থেকেই টুঙ্গিপাড়ায় শেখ বংশের শুরু।

দিনের পরে দিন যায়। শেখদের অনেকে ব্যবসা বাণিজ্যে নেমে পড়েন। বড় বড় মহাজনী নৌকায় তাঁরা মালামাল সাজিয়ে কত দূরদূরান্তে বাণিজ্য করতে যেতেন। এখনো ওই লাল ইটের পুরনো বাড়ির সমুখে

পড়ে আছে নৌকোর একটা মস্ত নোঙর। সেই কোন অতীতকালে সাক্ষী নৌকোর এই নোঙরটি।

শেখেদের বাড়ি, অনেক মানুষের বাড়ি। অনেক তাদের ঘর। তাদেরই একটা ঘরে, টিনের ঘরে, জন্ম নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু—বাংলার বন্ধু—বাংলার মানুষের বন্ধু।

শুধু কি বন্ধু? বাংলার মুক্তি আর স্বাধীনতা এসেছে তাঁরই হাতে। আমরা তাঁরই মন্ত্র—জয় বাংলা—গলায় তুলে নিয়ে যুদ্ধে যাই।

বঙ্গবন্ধুর জন্যেই বাংলা আজ স্বাধীন একটি দেশ।

বঙ্গবন্ধুই আমাদের দিয়েছেন লাল সবুজ পতাকা। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

বাংলার মাঠে মাঠে ফসলের সবুজ। সেই সবুজ জমিতে ভোরের প্রথম উঠে আসা লাল সূর্য আঁকা আমাদের পতাকা।

আমরা গেয়ে উঠি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত:

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

রবীন্দ্রনাথের লেখা এই গান আমাদের গলায় তুলে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি আমাদের জাতির জনক। বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান তিনি। বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে তাঁর মতো আর একজন মানুষ আমরা দেখি না।

কত শত বছর থেকে বাঙালি স্বাধীন হবার স্বপ্ন দেখেছে। কত যুদ্ধ করেছে। কোনো যুদ্ধেই বাঙালি জয়ী হতে পারেনি। অবশেষে উনিশশ' একাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুর হাতে আসে বাঙালির অনেক দিনের স্বপ্নের সেই স্বাধীনতা।

এই বাংলার চাষী মজুর, খেটে খাওয়া মানুষ, দুঃখী মানুষ, বিদেশীর লোহার শেকলে বাঁধা মানুষ, ইংরেজের চাবুকে মার খাওয়া মানুষ, পরাধীন মানুষ, পাকিস্তানের হাতে কষ্ট পাওয়া মানুষ, একদিন তারা স্বাধীন হয় বঙ্গবন্ধুর জন্যে।

পাকিস্তানের হাতে শুধু কি সাধারণ কষ্ট ভোগ করেছে বাঙালিরা? না।

পাকিস্তানি মিলিটারি বাঙালিকে ধরে ধরে মেরেছে। মা বোনের ইজ্জত সম্মান নষ্ট করেছে। একাত্তর সালে তারা আমাদের তিরিশ লাখ মানুষ খুন

করেছে। আজও প্রতিদিন ভোরবেলা ও সন্ধ্যায় যেন তাদেরই রক্তের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ওই লাল সূর্য।

কেবল কি তাঁদেরই রক্ত?

আমাদের পতাকায় ওই লাল সূর্য—ওতে বঙ্গবন্ধুর বুকের রক্তের লাল রঙটিও রয়েছে। যখন ওই পতাকা আমরা দেখি, যখন ওই পতাকাকে আমরা অভিবাদন করি, আমরা বঙ্গবন্ধুকেই দেখে উঠি, আমরা বঙ্গবন্ধুকেই অভিবাদন করি।

জয় বঙ্গবন্ধু! জয় বাংলা!

২

মায়ের মুখে গল্প শুনি। মা বলেন, আমাদের প্রিয় যাঁরা, তাঁরা মরে যাবার পর আকাশের তারা হয়ে যান।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি। তারায় ভরা আকাশ। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল যে তারাটি জ্বলজ্বল করছে, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে ওই—ওই তবে বঙ্গবন্ধু। তাঁর চেয়ে প্রিয় আমাদের আর কে আছেন?

বাবা বলেন, ইতিহাসে একেকটা মানুষ আসেন সূর্যের মতো। তাঁরা এলে আঁধার কেটে যায়। আলো ছড়িয়ে পড়ে। চারদিক আলো হয়ে ওঠে।

ভোরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখি। রাতের আঁধার কেটে আলো ফুটছে। চারদিক আলো আর আলো। আলোর ঢল নেমেছে গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, নগরে, বন্দরে। পাখপাখালি জেগে উঠেছে। মানুষেরা কাজে বেরিয়েছে। আলোয় ধোওয়া তাদের মুখ।

বঙ্গবন্ধু তবে আমাদের সেই সূর্য। তিনি বাংলার ইতিহাসে সূর্যের মতো উদিত হয়েছিলেন। আমরা তাঁর আলোয় অন্ধকার থেকে জেগে উঠেছি।

সাগরের কাছে যাই। নীল সাগর। যতদূর চোখ যায় কী বিপুল বিশাল পানির বিস্তার। সেই পানিতে ঢেউয়ের পরে ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় রোদ পড়েছে, নাচ করছে, যেন সোনার শিশুরা খেলা করছে সাগরের বুকে।

শিক্ষক বলেন, তাকিয়ে দেখো সাগরের দিকে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাগরের মতো। তাঁর বুকে শিশুদের তিনি অনুভব করতেন। তাঁর জন্মদিন বাংলার শিশুদের জন্যে সোনার একটি দিন। শিশুরা বড় হবে, তাদের জীবন যেন মানুষের জীবন হয়, তাই তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।

হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরিয়ে যাই। ওই দূরে খুব উঁচু একটা গাছ।

শিমুল গাছ। তার ডালে ডালে লাল টকটকে ফুল। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছটা। আকাশেও যেন লালের ছোঁয়া লেগেছে। কাছে গিয়ে দেখি সেই কোন সকাল থেকে গাছটি থেকে টুপটাপ করে ফুল ঝরছে। গাছের পায়ের কাছে মাটি ছেয়ে আছে শিমুলের লাল ফুল।

ইতিহাস বলে, বঙ্গবন্ধু আমাদের এই দেশটার জন্যে বুকের রক্ত দিয়েছেন। তাঁর রক্তে মাটি এখনো ভিজে লাল হয়ে আছে।

ইতিহাস আরো বলে, বাংলার পলিমাটির মতো বঙ্গবন্ধুর বুক। বর্ষায় এ মাটি ভিজে কোমল হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মের খর রৌদ্র শুকিয়ে সেই মাটিই পাথরের মতো হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধুর বুকও আমাদের জন্যে বৃষ্টিভেজা ওই মাটির মতো কোমল হয়ে যেতো। আবার আমাদের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে সেই তিনিই পাথরের মতো কঠিন ছিলেন। কেউ তাঁকে ভাঙতে পারতো না, কেউ তাঁকে ভাঙতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু সারাটা জীবন পাথরের মতো কঠিন ছিলেন তাঁর লড়াইয়ে। এ লড়াই বাঙালির অধিকার আদায়ের লড়াই। সেই থেকে বাংলার স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম। এই হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সারা জীবন। এই হচ্ছে তাঁর জীবনের গল্প।

বঙ্গবন্ধুর গল্পটাই বাংলাদেশের ইতিহাস। তাঁর জীবনটাই বীরের একটি গাথা—বীরগাথা।

৩

আমরা সবাই এ পৃথিবীতে মায়ের কোলে আসি। এই মা যেমন একজন মানুষ, আমাদের আরেক মা আছে, সে আমাদের দেশের মাটি। তাই সে আমাদের মাতৃভূমি। আমাদের কত সৌভাগ্য বঙ্গবন্ধু এই মাতৃভূমিতেই জন্মেছিলেন।

তিনি তাঁর মা সায়েরা খাতুনের কোলে এসেছিলেন। বাবা শেখ লুৎফর রহমান। ইংরেজি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়। দিনটি ছিলো বুধবার।

বুধ! একটি গ্রহের নাম। সূর্যের চারপাশে অনেকগুলো গ্রহ। তাদের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীও একটি গ্রহ। বুধও সূর্যেরই একটি গ্রহ। সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধ। আর এই গ্রহের নামেই সপ্তাহের একটি দিনের নাম বুধবার।

সূর্যের এত কাছে থাকা বুধগ্রহের নামে নাম বুধবারে জন্ম নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাই বুঝি তাঁর জীবনে সূর্যের এমন দীপ্তি আর তেজ।

সূর্যের আলোয় অন্ধকার কেটে যায়, রাতের পরে ভোর আসে। বঙ্গবন্ধুও আমাদের জীবনে পরাধীনতার অন্ধকার দূর করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন বলেই আমাদের জীবনে ভোরের আলো ঝলমল করে ওঠে।

বঙ্গবন্ধুর জীবন আর বাংলাদেশ, যেন একই বোঁটায় দুটি ফুল। দোপাটি ফুলের মতোই বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু আমাদের জীবনের বাগান আলো করে ফুটে আছেন।

এ ফুল কোনোদিন ঝরবে না। যতদিন আমাদের অন্তরে বঙ্গবন্ধু আছেন ততদিন বাংলাদেশও আছে। বঙ্গবন্ধু বেঁচে নেই, তাঁর আদর্শ বেঁচে আছে। তাই তিনি অমর।

৪

বঙ্গবন্ধু বাবা মা-র বড় ছেলে। আকিকার সময় নানা তাঁর নাম রেখেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাবা মা আদর করে ডাকতেন—খোকা। খোকা ছিলো বঙ্গবন্ধুর ডাকনাম।

একদিন দেশের মানুষ তাঁকে নাম দেয় বঙ্গবন্ধু। এ সব অনেক পরের কথা। এখন তিনি ছোট। এখন তিনি খোকা।

অল্প বয়সেই খুব লম্বা ছিলো খোকা। খোকা যখন বঙ্গবন্ধু তখনও দেখি কী তিনি লম্বা! সমাবেশে সবার মাথা ছাপিয়ে বঙ্গবন্ধুর মাথা। সারা জীবন তিনি না ছিলেন মোটা, না ছিলেন রোগা পাতলা। চোখে ছিলো চশমা। সেই ছেলেবেলায় একটা অসুখ হয়েছিলো। সেই থেকে খোকার চোখে চশমা।

খোকার মনে মায়া! সবার জন্যে মায়া! সেই ছেলেবেলা থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বুকভরা তাঁর মায়া আর মায়া।

গ্রামের কে গরীব, খেতে পায় না, বাড়ির শস্য গোলা থেকে খোকা তাদের চাল দিচ্ছে। খোকার কথা—বা রে! আমরা ভাত খাবো, ওরা না খেয়ে থাকবে, তাই হয়?

বাবা মা অবাক হয়ে থাকেন খোকার দিকে। কোথা থেকে এই ফেরেশতা এসে জন্ম নিলো তাঁদের ঘরে!

মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে। গ্রামের গরিব মানুষ খোকার চোখে পড়ে। শীতে থরথর করে কাঁপছে। দেখা মাত্র কাজ! খোকা নিজের গা থেকে গরম কাপড়টা খুলে পরিয়ে দেয় গরিবটির গায়ে।

গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে ভাবে, দুনিয়ায় তাহলে দুঃখী মানুষের দুঃখ বোঝার লোক আজও আছে!

খোকা তখনও লোক হয়ে ওঠেনি, কেবলি একটা বাচ্চা ছেলে। শেখদের বাড়ির ছেলে। একদিন যে এই ছেলেটিই বড় হয়ে দেশের সবার দুঃখ দূর করবে, সেদিন কেউ ভাবতেও পারেনি।

সাত বছর বয়সে খোকা গিমাডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

গিমাডাঙা? সে আবার কোথায়? না, টুঙ্গিপাড়া থেকে বেশি দূরে নয়। টুঙ্গিপাড়ার পাশের গ্রামটারই নাম গিমাডাঙা।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই ছোট্ট একটা খাল। সেই খালের ওপারেই গিমাডাঙার স্কুল। এখনো সেই স্কুলটা আছে। স্কুলটার এখন দালান হয়েছে। খোকার সময়ে ছিলো সাধারণ একটা ঘর।

টুঙ্গিপাড়ার বাড়ি থেকে নৌকায় খাল পেরিয়ে গিমাডাঙায় স্কুলে যায় খোকা। বছর দুই পর একদিন কী হলো, খালের পানিতে নৌকা ডুবে গেলো। সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠলো খোকা। সেই যে প্রাণে বেঁচে গেলো, গিমাডাঙা স্কুলে আর নয়।

খোকাকে ভর্তি করে দেয়া হলো অন্য একটা স্কুলে। কাছেই গোপালগঞ্জ শহর। সেখানে আছে খ্রিস্টান পাদ্রীদের স্থাপন করা একটা স্কুল। নাম, গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল। সেই স্কুলে খোকা পড়তে শুরু করলো।

৫

গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে হিন্দু মুসলমান কত ছাত্র। সবার সঙ্গে খোকার ভাব ভালোবাসা। একসঙ্গে মাঠে তারা খেলে। গল্প করে। পড়া করে। ভালো ফুটবল খেলে খোকা।

খোকার দাদা শেখ আবদুল হামিদের একদিন শখ হলো নাতির খেলা দেখবেন। দাদাকে দেখে খুব তেজে খেলছে খোকা। কিন্তু রোগা পাতলা তো! ফুটবলে কিক্ মেরে নিজেই মাঠে চিৎ হয়ে পড়ে যায় খোকা। বলটা কিন্তু ঠিকই গোলে ঢুকে যায়। কাণ্ড দেখে দাদাসাহেব হেসেই মরেন।